icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৭ ■ সংখ্যা ২ ■ অগ্রহায়ণ ১৪১৫

ঘুম

সমস্যা ও সমাধান

মোঃ মনিরুল ইসলাম
আইসিডিডিআর,বি

সুস্থ থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীর জন্যই ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন, মানুষের জন্য তো বটেই। স্মরণশক্তি, মেধা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ঘুম-হওয়া অত্যন্ত জরুরী। যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন তাদের শরীরে বিপাক ক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডের গতি, তাপমাত্রা ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম বেড়ে যেতে পারে; ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এছাড়াও, ঘুম না-হওয়ার কারণে হতাশা ও উৎকণ্ঠায় নিপতিত-হওয়া এবং নেশা-করার ঝুঁকি বেড়ে যায়। অনিদ্রায় আক্রান্ত ব্যক্তির সামাজিক কার্যক্রম ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

প্রতিদিন আমাদের কমপক্ষে ৬-৯ ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন। খুব কম ঘুমানো কিংবা খুব বেশি ঘুমানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শিশুদের বেশি ঘুমানো প্রয়োজন। একটি সদ্যোজাত শিশু অনধিক ১৮ ঘণ্টা ঘুমাতে পারে। বছরপ্রতি গড়ে এক থেকে দেড় ঘণ্টা করে ঘুমের এই সময় কমে যেতে থাকে। এই হিসেবে, ৫ বছর বয়সে ঘুমের সময় এসে দাঁড়ায় ১১-১৩ ঘণ্টাতে। এরপর প্রতি ৫ বছরে গড়ে এক থেকে দেড় ঘণ্টা করে কমতে কমতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গড়ে ৭ ঘণ্টা ঘুমালেই চলে। রাতে ঘুমিয়ে ওঠার পর যদি কেউ শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো বোধ করে তবেই ধরে নিতে হবে তার ভালো ঘুম হয়েছে।

শতকরা প্রায় ১০-৩০ ভাগ লোক ঘুমের সমস্যায় ভোগেন। পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি মানুষের ভালো ঘুম হয় না। সাধারণভাবে মহিলাদের ঘুম কম হয়। বয়স্ক ও কোনো কোনো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এ-সমস্যায় বেশি ভোগেন। যাদের ঘুমের সমস্যার বংশগত ইতিহাস আছে তাদের ঘুম ভালো না-হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দুঃশ্চিন্তা বা হতাশার কারণেও কারো ভালো ঘুম না-হতে পারে। শুধুমাত্র হতাশাই ভালো ঘুম না-হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ঘুমচক্র

রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর থেকে ঘুমচক্র শুরু হয়। সাধারণত দুই প্রকারের ঘুমের সমন্বয়ে একটি ঘুমচক্র তৈরি হয়। চক্রের প্রথমভাগে চোখ খুব দ্রুত এদিক-ওদিক নড়াচড়া করে না এবং এ-অবস্থা প্রায় ৬০-৯০ মিনিট ধরে চলতে থাকে। ঘুমচক্রের এ-অংশকে 'দ্রুত চোখ না-নড়ানো ঘুম' বলে। এর প্রথমভাগে আমরা তন্দ্রালু হয়ে পড়ি এবং ধীরে ধীরে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ি।

ঘুমচক্রের শেষভাগে গভীর ঘুমের মধ্যে চোখ খুব দ্রুত এদিক-ওদিক নড়াচড়া করে যা প্রায় ১০-১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ-অবস্থাকে 'দ্রুত চোখ-নড়ানো ঘুম' বলা হয়। এ-ঘুমের মধ্যেই আমরা স্বপ্ন দেখে থাকি। একরাতের ঘুমের মধ্যে এই উভয় প্রকারের ঘুম পর্যায়ক্রমে ৫-৬ বার চলতে থাকে যা জেগে-ওঠার আগে পর্যন্ত চলতে থাকে। বয়সভেদে উভয় প্রকারের ঘুমের এই সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। 'দ্রুত চোখ-নড়ানো ঘুম' শিশুদের ক্ষেত্রে মোট ঘুমের শতকরা প্রায় ৫০-৮০ ভাগ, কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে মাত্র ১৫-২০ ভাগ।

দেহঘড়ি ও ঘুমচক্র

মস্তিষ্কের চক্ষু-গোলক থেকে পিছনের দিকে স্নায়ু বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক উপরের অংশেই রয়েছে দেহঘড়ি। এই ঘড়িই নিয়ন্ত্রণ করে কখন আমরা ঘুমিয়ে পড়বো। আলো এবং ব্যায়াম দ্বারা এই ঘড়ির সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের কিছু কর্মকাণ্ডও এই ঘড়িকে পরিবর্তন করতে পারে। ধরুন, আপনি অনেকদিন জাপানে থেকে বাংলাদেশে এসেছেন, আপনার দেহঘড়ির সময় অনুযায়ী আপনার ঘুমচক্র বাংলাদেশীদের তুলনায় আগে শুরু হবে। কিছুদিন যাওয়ার পর দেহঘড়ির সময় বাংলাদেশের সময়ের সাথে খাপ খেয়ে যাবে। যদি কোনো কারণে বারবার ঘুমের চক্র বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও, ঘুমের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিচে ঘুমের কিছু সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো। তার আগে ভালো ঘুমানোর কয়েকটি উপায় বাতলে দেওয়া হলো:

- প্রতিদিন একই সময় বিছানায় শুয়ে পড়ুন এবং একই সময় ঘুম থেকে উঠে পড়ুন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও এই নিয়ম মেনে চলুন
- খুব বেশি মনোযোগ দিতে হয় এমন কাজ অথবা খুব বেশি শারীরিক শ্রমের কাজ বিছানায় যাওয়ার ২-৩ ঘণ্টা আগে থেকে বন্ধ করে দিন। ঘুমানোর আগে খুব বেশি খাবার গ্রহণ বা ভারী ব্যায়াম থেকেও বিরত থাকুন
- দিনের বেলায় ঘুমানো পরিহার করুন; তবে শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন
- উষ্ণ পানিতে গোসল করতে পারেন। উষ্ণ পানির গোসল শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা কমিয়ে ঘুমাতে সাহায্য করে
- নিয়মিত সকালে/বিকালে ব্যায়াম করুন
- দিনের বেলায় উজ্জ্বল আলোতে থাকার চেষ্টা করুন এবং রাতে উজ্জ্বল আলো পরিহার করুন
- বিছানায় যাওয়ার আগে প্রশান্তিকর পদ্ধতি, যেমন গভীর শ্বাসগ্রহণ, ধ্যান বা যোগ-ব্যায়াম করা যেতে পারে
- ঘুম-সহায়ক পরিবেশে ঘুমানোর চেষ্টা করুন, যেমন ঘুমানোর জায়গাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা

ভেতরের পাতায়

মোলার প্রেগন্যান্সি ৩
থ্যালাসেমিয়া ৫
আইসিডিডিআর,বি-র ইতিহাসে কয়েকটি মাইলফলক ৬
কিডনীর রোগ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক — আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক — প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক — এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক — এম এ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস — সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ — হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

এবং নীরব করে নিন। যারা মেসে বা হলে থাকেন, কানে তুলা বা ear-plug এবং চোখে কোনো কাপড় বা eye-shield ব্যবহার করতে পারেন।

ঘুমের সমস্যা

কোনো কারণে স্বাভাবিক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে আমরা তাকে ঘুমের সমস্যা বলে চিহ্নিত করি। যেসব কারণে তা ঘটতে পারে এর মধ্যে নিচে উল্লেখিত সমস্যাগুলো প্রধান:

ভালো ঘুম না-হওয়া

অনেক পথ বিমানে অতিক্রম করার পর, রোগের কারণে, মানসিক চাপ বা মানসিক অসুস্থতার জন্য ভালো ঘুম না-হতে পারে। রোগীর রোগ নিরাময় বা মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে ঘুমের সমস্যা এমনিতেই কমে যায়। অহেতুক চিন্তা না-করা, ঘুম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করা এবং ভালো ঘুমানোর উপায়সমূহ মেনে চললে ভালো ঘুম হতে পারে। এ-সমস্যায় চিকিৎসার মৌলিক বিষয়টি হলো ঘুমচক্রকে একটি নিয়মিত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে-আসা। অনেক সময় আচরণভিত্তিক চিকিৎসা ঘুমচক্রের নিয়মিতকরণে কার্যকর হয় না। অনেক উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি তাদের ঘুমের সাথে সম্পর্কিত সহায়ক কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। এদেরকে স্বল্পসময়ের জন্য মানসিকভাবে আচ্ছন্ন করার উপাদান (hypnotic agents) বা ঘুমের টেবলেট দেওয়া যেতে পারে। তবে দীর্ঘ-মেয়াদী চিকিৎসা বা মানসিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া শ্রেয়। কারণ দীর্ঘদিন ঘুমের টেবলেট খেলে তা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে, আর বারবার হতাশায় আক্রান্ত হলে হয়তো সারা জীবনই অষুধ খেতে হতে পারে।

ঘুমের মধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া বা হাঁটা

ঘুমের মধ্যে চোখের নড়াচড়া যখন কম হয় (যে-প্রবণতা প্রধানত ৩-৫ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়) তখন হঠাৎ করে শিশু ভয় পেয়ে জেগে উঠতে পারে এবং চিৎকার করতে পারে। অথচ সে কিছুই মনে করতে পারে না কেন ভয় পেয়েছে। কখনো হয়তো এটুকু বলতে পারে: সে ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে।

এছাড়া, কোনো শিশু, এমনকি বয়স্ক লোকও, ঘুমের মধ্যে হাঁটে, ঘুমন্ত অবস্থায় এরা বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় বা চুলায় আগুন জ্বালায়। এদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এ-সমস্যা এমনিতেই সেরে যেতে পারে; তবে কখনো কখনো চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এসব সমস্যায় আক্রান্ত লোকদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। রাতে দরজায় তালা দিয়ে রাখা, দিয়াশলাই বা ছুরিজাতীয় জিনিষ নাগালের বাইরে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

ঘুমের মধ্যে নাক-ডাকা ও শ্বাসকষ্ট

কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার মাংসপেশী শিথিল হয়ে পড়ে। গলার মাংসপেশী শিথিল হয়ে পড়ার কারণে নাক-ডাকা বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে। যারা বয়স্ক বা স্থূলদেহী তাদের এ-সমস্যা বেশি হতে পারে। নিচে উল্লেখিত উপায়সমূহ অনেক ক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে:

নাক-ডাকার উপসর্গ নিরাময়ের উপায়

- এক-পাশে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমানো
- সিগারেট ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা
- অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা না-দিলে ঘুমের অষুধ না-খাওয়া
- এলার্জি, হাঁপানী বা নাকের সমস্যার জন্য ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা

ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্ট নিরাময়ের উপায়

- ওজন কমানো
- ডাক্তারের পরামর্শমত একধরনের মাস্ক বা মুখোশ ব্যবহার করা

দুঃস্বপ্ন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

ঘুমের মধ্যে যখন চোখের নড়াচড়া খুব বেশি চলতে থাকে তখন আমরা স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখে থাকি। দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, কিংবা কোনো কোনো অষুধ সেবন এধরনের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের কারণ হতে পারে। কখনো কখনো বিনা কারণেও এ-অবস্থা ঘটতে পারে। কারণগুলো পরিহার করতে পারলে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।

অত্যধিক ঘুমজনিত সমস্যা

কেউ কেউ দিনের বেলায়ও এমনভাবে ঘুমে আক্রান্ত হন যে, না-ঘুমিয়ে উপায় থাকে না। এরা একটু ঘুমিয়ে নিলে আবারও নিয়মিত কাজ করতে পারেন। এধরনের ঘুমের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিজের বা অন্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ কাজ (যেমন গাড়ি-চালনা, যন্ত্র-চালনা) থেকে বিরত থাকা উচিত এবং চিকিৎসকের পরামর্শমত অষুধ সেবন করা উচিত।

শেষ কথা

যেকোনো ধরনের ঘুমের সমস্যায় উপরোল্লিখিত ভালো ঘুমানোর উপায়গুলো মেনে চলুন। যদি এতে কাজ না-হয় তবে ৫-৭ দিন ডায়াজিপাম গোত্রের অষুধ খেয়ে দেখুন। তাতেও কাজ না-হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ■

মোলার প্রেগন্যান্সি

আরিফা শারমিন মায়া
পুটিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিবপুর, নরসিংদী
মোঃ ইকবাল
আইসিডিডিআর,বি

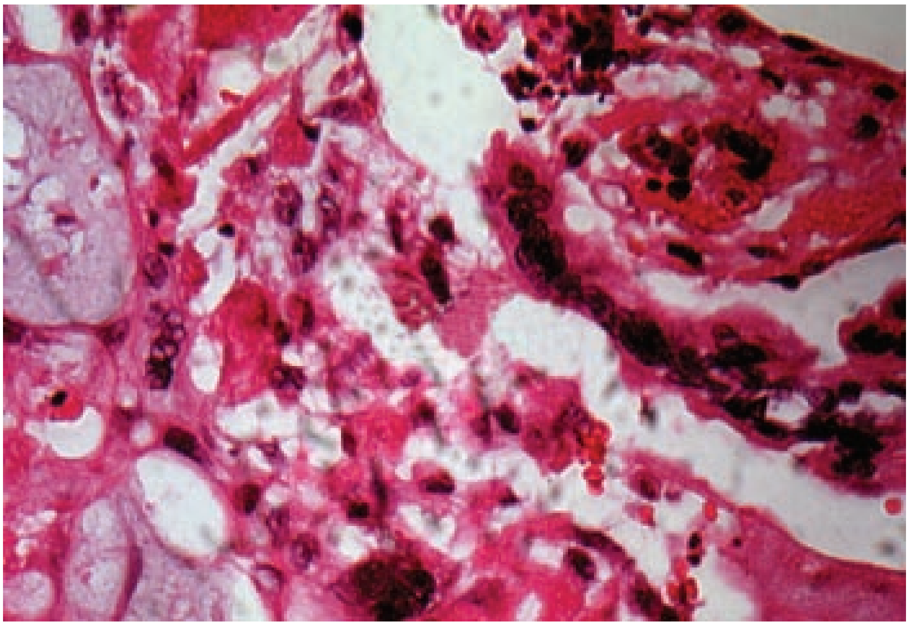

মোলার প্রেগন্যান্সির ফসল সন্তান নয়, লাল আঙুরের থোকার মত একদলা মাংসপিণ্ড

পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র এবং সুন্দর ডাক হচ্ছে 'মা'। এক অক্ষরের একটি শব্দ অথচ এর মধ্যেই রয়েছে সীমাহীন ব্যাপকতা। মা হতে হলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। মতিন সাহেবের স্ত্রী খেয়াও তেমনি মা-ডাক শোনার জন্য নিজের মধ্যে আরেকটি জীবনের অনুভূতি লালন করছিলেন। সাধারণ নিয়মে মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের ২০ দিন পরও যখন হচ্ছিলো না তখন প্রস্রাব পরীক্ষা করে জানতে পারলেন: তিনি গর্ভবতী। কী যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো স্বামী-স্ত্রীর মনের মধ্যে!

এই ছোট্ট পরিবারটি থাকতো খুব ছোট এক মফস্বল শহরে। আশ-পাশের বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত। বাবা মারা যাওয়ার কারণে অল্পবয়সে খেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। গর্ভকালীন সময়ের স্বাভাবিক উপসর্গগুলো তার মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সাড়ে তিন মাস পার হয়ে যাওয়ার পর বমির মাত্রাটা অন্যদের তুলনায় বেশি হচ্ছে। এরপর তাঁর গর্ভাবস্থা যখন ৪ মাসে পড়লো তখন হঠাৎ খেয়া খেয়াল করলেন তাঁর যোনিপথ/মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্ত যাচ্ছে এবং এর সাথে তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। আনুমানিক আধাঘণ্টা পর তিনি দেখলেন: আঙুরের থোকার মত রক্তমাখা একটি মাংসপিণ্ড বের হলো। খেয়া প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন।

সবচেয়ে দুঃখজনক যা ঘটলো সেটি হচ্ছে: পাড়া-প্রতিবেশী সবাই বলাবলি শুরু করলো মেয়ের ওপর জিনের আছর হয়েছে; কেউ বললো ভুতে ধরেছে; কেউ বললো মেয়েটি অপয়া এবং এই মেয়ে সমাজে থাকলে গর্ভবতী মায়েদের সুস্থ বাচ্চা হবে না।

আসলে জিন-ভুত কিছুই না এবং মেয়েটিও অপয়া নয়। মেয়েটির গর্ভাবস্থায় একটি রোগ/অসুখ হয়েছিলো যাকে বলে 'মোলার প্রেগন্যান্সি' (molar pregnancy) বা hydatidiform mole। জরায়ু থেকে যা বের হয় তা দেখতে অবিকল লাল রঙের বড় আঙুরের থোকার মত। উপরোক্ত ঘটনাটি ১৫ বছর আগের। এই রোগটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব কম জানতো। পেটে এসে বাচ্চা নষ্ট হয় এটা তো স্বাভাবিক, কিন্তু গর্ভের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও জরায়ুপথে বাচ্চার বদলে ঋতুস্রাবের রাস্তা দিয়ে আঙুরের থোকার মত পচা মাংসের পিণ্ড বের হয় এটা অস্বাভাবিক ঘটনা। যাই হোক, একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা এবং আধুনিকতার উৎকর্ষের সাথে-সাথে এই রোগের প্রকোপ যেমন বেড়েছে এবং তেমনি বেড়েছে জানার পরিধিও।

মোলার প্রেগন্যান্সিতে গর্ভধারণের ৩-৪ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গর্ভফুল তৈরি হয় যার মাধ্যমে শিশু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি মায়ের শরীর থেকে গ্রহণ করে। অপ্রয়োজনীয় পদার্থ গর্ভফুলের মাধ্যমে মায়ের শরীরে গিয়ে পরিশোধিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কারণে এই গর্ভফুল স্বাভাবিকভাবে তৈরি না-হয়ে এর গঠন ত্রুটিপূর্ণ হয়। কিছু কিছু অংশ স্ফীত হয়ে পানিভর্তি ছোট ছোট থলের আকার ধারণ করে যেগুলোর সমষ্টিকে মোল (mole) বলা হয়। এগুলো হাইডাটিড সিস্ট (যা একধরনের পরজীবীঘটিত রোগ)-এর মত দেখায়। এজন্যই মোলার প্রেগন্যান্সির আরেক নাম হাইডাটিডিফরম মোল (hydatidiform mole)। মোলার প্রেগন্যান্সিতে আপাতদৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ গর্ভবতী নারীর লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এই গর্ভের ফলে সন্তানের জন্ম হয় না।

মোলার প্রেগন্যান্সির প্রকোপ

এ-সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ফিলিপাইনে, যেখানে প্রতি ৮০ জনে ১ জন আক্রান্ত হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশ অঞ্চলে প্রতি ৪০০ জনের মধ্যে ১ জন আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর রেকর্ড থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে: এ-সমস্যার হার বাংলাদেশে ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং আক্রান্ত মহিলাদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সদস্য।

মোলার প্রেগন্যান্সির কারণ

মোলার প্রেগন্যান্সি অনেক কারণে হতে পারে। এর মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলোই প্রধান:

১. যারা অতি অল্পবয়সে এবং অধিক বয়সে (৩৫ বছরের পর) গর্ভধারণ করে তাদের মধ্যে এ-সমস্যা বেশি লক্ষ করা যায়।

২. অপরিমিত পুষ্টি বা অপুষ্টি, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় উপাদান এবং ক্যারোটিনের ঘাটতি থাকলেও এ-রোগের আশংকা বেড়ে যায়।

৩. সমীক্ষায় দেখা গেছে: যেসব মহিলার রক্তের গ্রুপ 'A' কিংবা 'AB' এবং স্বামীর রক্তের গ্রুপ 'O' তাদের ক্ষেত্রে এ-সমস্যা বেশি ঘটে।

৪. বংশগত কারণেও এটি হতে পারে এবং এর জন্য সম্পূর্ণত পুরুষ সঙ্গীই দায়ী, নারী নয়।

৫. একবার কারো মোলার প্রেগন্যান্সি দেখা দিলে পরবর্তী কালে তা হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ১-৪ ভাগ বেড়ে যায়।

উপসর্গ

অল্পবয়সী অথবা বেশিবয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮-১২ সপ্তাহ ধরে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। অনেক সময় ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত ঋতুস্রাব বন্ধ থাকতে পারে। সাধারণভাবে সবার ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন উপসর্গ থাকবে। পরবর্তী পর্যায়ে আক্রান্ত মহিলাদের নিচে উল্লেখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে:

- যোনিপথ/মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়া–

শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে এটাই প্রথম উপসর্গ

- তলপেটে ব্যথা (সামান্য থেকে অনেক বেশি হতে পারে)
- প্রচুর বমি হয়
- কোনো কারণ ছাড়াই রোগী খুব অসুস্থ বোধ করবে। শ্বাসকষ্ট হবে, হাত-পা কাঁপবে এবং বুক ধড়ফড় করছে এমনটি বলবে। মোলার টিস্যুগুলো ফুসফুসে ছড়ালে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এধরনের রোগীদের থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা বেড়ে যায়। ফলে, শারীরিক অস্থিরতাও বেড়ে যায়।

যোনিপথ দিয়ে আঙুরের থোকার মত কিছু জিনিষ রক্তের সাথে বেরিয়ে আসতে পারে এবং এমনটি দেখা গেলে নিশ্চিত করে বলা যায়: এটি মোলার প্রেগন্যান্সি। অনেক সময় থোকার সাথে মৃত বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অংশবিশেষ থাকে (যাকে আংশিক মোল বলা হয়); কিন্তু শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না; পুরো মাংসপিণ্ডটাই আঙুরের থোকার মত জরায়ুর মধ্যে বড় হতে থাকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত লক্ষণসমূহ

রোগীকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার রক্তশূন্যতা রয়েছে এবং এসব রোগীর শতকরা ৫০ ভাগের ক্ষেত্রেই রক্তচাপ বেশি হতে দেখা যায় এবং পায়ে পানি জমে।

পেট পরীক্ষা করলে জরায়ুর আকার মাসিক বন্ধ হওয়ার সময়ের চেয়ে বড় মনে হবে এবং স্পর্শ করলে ময়দার মত থলথলে অনুভূত হবে। হাত দিলে বাচ্চার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা বাচ্চার হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভূত হবে না। যারা আগে একবার মা হয়েছেন তারা বলেন: আমার বাচ্চা তো নড়াচড়া করার কথা, কিন্তু তেমন কিছুই টের পাচ্ছি না।

গর্ভকালীন সময়ে সাধারণত রক্ত এবং প্রস্রাবের যেসব পরীক্ষা করা হয় তার সবই করতে হয়। বিশেষভাবে প্রস্রাব এবং একটি হরমোন টেস্ট সম্পন্ন করতে বলা হয় যার নাম human chorionic gonadotrophin (HCG)। স্বাভাবিক সব গর্ভধারণের সময়েও শরীরে এই হরমোন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মোলার প্রেগন্যান্সিতে এটি প্রস্রাবে/রক্তে মাত্রাতিরিক্ত হারে পাওয়া যায়। এতে নিশ্চিতভাবে এই রোগটি নির্ণয় করা যায়।

জরায়ুর ভেতরের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তুষারপাতের মত ঝাপসা দেখা যাবে এবং দু'দিকের ডিম্বাশয় শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে ফোলা বা বড় পাওয়া যাবে। বুকের এক্স-রে করতে বলা হয়। যেহেতু মোলার টিস্যু ফুসফুসেও ছড়িয়ে যায়, এক্স-রে করলে এর মাধ্যমে রোগটির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

রোগের জটিলতা

তাৎক্ষণিক সমস্যা

- যোনিপথে প্রচুর রক্তপাত হয় এবং এর ফলে রোগী জ্ঞান হারাতে পারে
- সেপসিসজনিত প্রদাহ হতে পারে
- জরায়ু ফুটো হয়ে যেতে পারে
- শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে
- রক্তজমাটজনিত নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে

দেরিতে দেখা-দেওয়া সমস্যা

- স্থায়ী হাইডাটিডিফরম মোল হিসেবে কিছু মোলার টিস্যু থেকে যায়। দুই/তিন মাস পরপর রক্তপাত হয়, ওয়াশ করলেও সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় না।
- কোরিওকারসিনোমা (choriocarcinoma) নামক এক ধরনের মারাত্মক ক্যান্সার (highly-malignant tumour) দেখা দিতে পারে। এক কথায় একে গর্ভফুলের ক্যান্সার বলা হয়।

চিকিৎসা

মোলার প্রেগন্যান্সিতে চিকিৎসার মূলনীতি হচ্ছে:

- যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে তা পূরণ করা এবং প্রদাহ (infection) প্রতিরোধ করা
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জরায়ুর ভেতর থেকে মোল অর্থাৎ আঙুরসদৃশ থোকাগুলো বের করে আনা। সাকশান ইভাকুয়েশন (suction evacuation) বা সাকশান কিউরেটেজ (suction curettage) করে এগুলো বের করা হয়। সাধারণত লোকজন একেই ওয়াশ-করা বলে
- নিয়মিত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকা, যাতে পরবর্তী কালে এই সমস্যা স্থায়ীরূপ ধারণ করে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে না-পারে

কোনো কারণে রক্তক্ষরণ বন্ধ না-হলে বা ওয়াশ-করা সম্ভব না-হলে জরায়ু ফুটো করে মোল বের করতে হয়। একে হিস্টেরোটোমি (hysterotomy) বলা হয়।

যাদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি কিংবা অল্পবয়সে সন্তানের জন্মদানসহ পরিবার গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে জরায়ু কেটে ফেলাই শ্রেয়। এই অস্ত্রোপচারকে হিস্টেরেকটোমি (hysterectomy) বলা হয়। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো: মহিলার রক্তের গ্রুপ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে জরায়ু ওয়াশ করার পর একটি এন্টি-ডি (anti-D) ইনজেকশন দিতে হবে।

চিকিৎসার গুরুত্ব

গ্রামে-গঞ্জে অনেক মহিলারই এমনটি ঘটছে কিন্তু আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশী কী বলবে এমনটি ভেবে অনেকেই তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিতে আসছে না। ফলে, এ-রোগের জটিলতা বেড়ে চলেছে এবং এরা নীরবে একধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি বহন করছে। অথচ এই রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে এবং নিয়মমত চিকিৎসা করালে আবারও সেই মহিলা সুস্থ বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে এবং গর্ভফুলের ক্যান্সারেরও পরিপূর্ণ চিকিৎসা রয়েছে যার ফলে রোগী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়।

অনেক মা মনে করতে পারেন: প্রথম বাচ্চা তো স্বাভাবিকভাবে হয়েছে, দ্বিতীয়বার আমার এ-সমস্যা হয়েছে, এটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু স্বাভাবিক বাচ্চা হওয়ার পরও যদি গর্ভফুলে এধরনের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই সেটা ক্যান্সার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। পরীক্ষা করে তাই দেখা গেছে। জরায়ু ওয়াশ করার পর প্রতিসপ্তাহে প্রস্রাবের HCG টেস্ট-করা এ-রোগের চিকিৎসার প্রধান দিক। টেস্ট একবার নেগেটিভ হলে এক মাস পরপর ৬ মাস পর্যন্ত এই পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হয়।

যাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য নিয়মিত আসা কোনো কারণে অসম্ভব মনে হয়, তারাও যেন হাসপাতালে আসা থেকে বিরত না-থাকেন; তাদেরকে প্রতিষেধক হিসেবে মেথোট্রাক্সেট টেবলেট বা ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হয়। আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার: চিকিৎসার শেষে এক বছরের মধ্যে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকতে হবে। এর পরে আবারও বাচ্চা নেওয়া যাবে। এই এক বছর জন্য নিয়ন্ত্রণের হরমোন পদ্ধতি (বড়ি/ইনজেকশন/ইমপ্লান্ট) ব্যবহার করা যাবে না।

উপসংহার

নারীর পূর্ণতা তার মাতৃত্বে। যে-দেশের ৮০ ভাগ নারী গ্রামে-গঞ্জে বাস করেন তাদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয় উচিত যে, মোলার প্রেগন্যান্সি কোনো পাপের ফসল নয়। অল্পবয়সে বিয়ে-হওয়া, পুষ্টিহীনতা এবং অনেক সময় বংশগত কারণেও এটি হতে পারে। সময়মত এবং নিয়মমত চিকিৎসা নিলে ক্যান্সারের মারাত্মক ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সুস্থভাবে বেঁচে থেকে সমাজে বসবাস করা যায়। ■

থ্যালাসেমিয়া

মোঃ দেলোয়ার হোসেন হাওলাদার
মোঃ আরিফুজ্জামান
মুসাফির মোঃ তাজুল ইসলাম
আইসিডিডিআর,বি

জন্মের পর শিশুকে ঘিরে নিকট-আত্মীয়দের প্রায়ই বলতে শোনা যায়: "দেখতে বাবার মত, মায়ের মত হয়েছে, নাকটা ঠিক বাবার মত, চোখটা পেয়েছে মায়ের মত" ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা-বাবা থেকে বংশগতভাবে প্রাপ্ত কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য শিশুর দেহে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। থ্যালাসেমিয়া এধরনের একটি রক্ত-সম্পর্কিত রোগ (blood disorder) যা উত্তরাধিকার সূত্রে মা-বাবার মাধ্যমে শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয়। এ-রোগে রোগীর রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। আমাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন নামক একটি উপাদান আছে যা লোহিত বা লাল-কণিকার মধ্যে থাকে এবং দেহে কার্যকর রক্তের পরিমাণ নির্দেশ করে। এটি অক্সিজেনকে শরীরের কোষে কোষে পৌছে দিতে সাহায্য করে। এই হিমোগ্লোবিন আয়রন ও প্রোটিন নিয়ে গঠিত। প্রোটিন চেইন আকারে থাকে যা কতগুলো জিন (gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হিমোগ্লোবিন গঠনে সাহায্য করে এমন জিনগুলোতে কোনো কারণে যদি অস্বাভাবিকতা (এক বা একাধিক জিন না-থাকা, কোনো জিনের ভিন্ন রূপ ধারণ করা, ইত্যাদি) দেখা দেয় তবে একজন সুস্থ মানুষের রক্তে লোহিত বা লাল-কণিকার আয়ুষ্কাল ১২০ দিন হলেও এক্ষেত্রে ১২০ দিনের আগেই সেগুলো ভেঙে যায়। ফলে, রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এমন অবস্থাকে থ্যালাসেমিয়া বলা হয়।

বিজ্ঞানী কুলি এ-রোগ আবিস্কার করেন বিধায় একে কুলি'র রক্তস্বল্পতা (Cooley's anaemia) বলা হয়। ইউরোপের ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো (গ্রিস, ইতালি), বিশেষ করে গ্রিস ছিলো এ-রোগের উৎসভূমি।

হিমোগ্লোবিন তৈরিতে আলফা-প্রোটিন চেইন এবং বিটা-গ্লোবিন চেইন কাজ করে। যদি আলফা-গ্লোবিন অংশে এ-সমস্যা দেখা দেয় তবে আলফা-থ্যালাসেমিয়া রোগ বলা হয় এবং বিটা-গ্লোবিন অংশে সমস্যা দেখা দিলে বিটা-থ্যালাসেমিয়া রোগ বলা হয়। এ-বিষয়ে কোন গ্রুপের কতগুলো জিন আক্রান্ত হলো তার ওপর এ-রোগের মাত্রা ও ধরন নির্ভর করে। তবে এ-রোগ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক নয়। এটি খাদ্য বা পানি কিংবা বাতাসের মাধ্যমেও ছড়ায় না।

রোগের লক্ষণ

- রোগী শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করে
- হাতের তালুসহ শরীর হলদে-ফ্যাকাসে ভাব ধারণ করে, দেখলে মনে হয় রোগী জন্ডিসে আক্রান্ত

- পেট, প্লীহা ও লিভার বড় হয়ে যায়
- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, হাড়গুলো সরু হয়ে যায়
- মুখমণ্ডল ও কপালের হাড় উঁচু হয়ে যায়
- প্রস্রাব গাঢ় দেখায়
- শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়

থ্যালাসেমিয়ার ব্যাপকতা

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এ-রোগের ব্যাপকতা রয়েছে। বর্তমানে রোগটি এশিয়াতেই বেশি লক্ষণীয়। বাংলাদেশে প্রধানত বিটা-থ্যালাসেমিয়া মেজর (beta-thalassemia major) এবং হিমোগ্লোবিন-ই-থ্যালাসেমিয়া (Hb-E-thalassemia) নামক দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়া রোগ রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশে শতকরা ৩ ভাগ লোক বিটা-থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছে। আগেই বলা হয়েছে: রোগটি বংশগত। শিশুর মধ্যে এই রোগটি মা-বাবার মাধ্যমে যে-প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তার মূলসূত্রগুলো নিম্নরূপ:

- মা-বাবা উভয়েই যদি বিটা-থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন, তবে প্রতি চারটি শিশুর মধ্যে একটির বিটা-থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগ হতে পারে।
- যদি বাবা কিংবা মার যেকোনো একজন বিটা-থ্যালাসেমিয়া জিনের বাহক হন এবং অপরজন

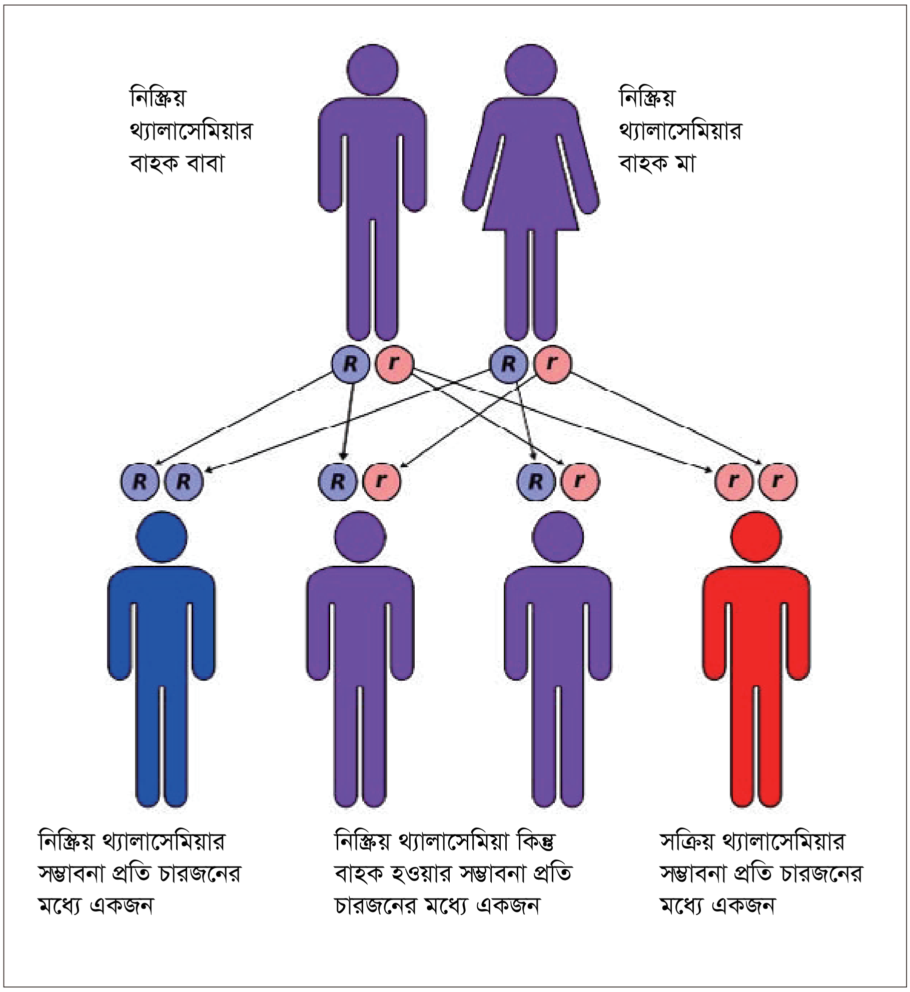

বংশানুক্রমিক রোগ বিস্তারের ধারা

হিমোগ্লোবিন-ই-এর বাহক হন তবে হিমোগ্লো-বিন-ই-থ্যালাসেমিয়া-প্রবণ শিশুর জন্মের সম্ভাবনা শতকরা ২৫ ভাগ।

- মা-বাবার যেকোনো একজন বাহক এবং অন্যজন সুস্থ হলে কোনোভাবেই শিশুর থ্যালাসেমিয়া রোগের সম্ভাবনা নেই। তবে এ-শিশুদের শতকরা ৫০ ভাগ বাহক হিসেবে এবং শতকরা ৫০ ভাগ সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ

একমাত্র জনসচেতনতাই হলো থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের প্রধান উপায়। নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে কাউকে বিয়ে করা উচিত নয়। বিয়ের আগে বর-কনে থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছে কি না তা দেখার জন্য হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস (Hb electrophoresis) নামক একটি রক্ত-পরীক্ষা সম্পন্ন করা উচিত। এই সচেতনতার ফলে ইউরোপে থ্যালাসেমিয়ার অভিশাপকে রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসা

প্রথমেই জেনে নেওয়া ভালো: যারা কেবল থ্যালাসেমিয়ার বাহক তাদের কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। রোগের ধরন এবং প্রচণ্ডতার ওপর থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা নির্ভর করে।

মারাত্মক থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে অস্থি-শ্লেষ্মার প্রতিস্থাপন (bone-marrow transplantation) করতে হয় যা খুবই ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, উপরোল্লিখিত কুলি'র রক্তশূন্যতার রোগীদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ত-পরিসঞ্চালন (blood transfusion) প্রয়োজন হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তে লোহিত-কণিকার দ্রুত ভাঙনের ফলে লিভার, প্লীহা ও পিত্তথলি বড় হয়ে যায়, কারণ এসব প্রত্যঙ্গে এসে আয়রন জমা হয়। এক্ষেত্রে আয়রন চেলেশন থেরাপি (iron chelation therapy) প্রয়োগ করা হয়। Injection desferol/desferrioxamine/kelfer নামক পদ্ধতি আয়রন অপসারণে অধিক কার্যকর। এছাড়া, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের শরীরে নতুন রক্ত উৎপাদনের জন্য ফলিক এসিড দেওয়া হয়। তবে যেসব খাদ্যে প্রচুর আয়রন আছে, যেমন গরুর মাংস, কলিজা, শুটকিমাছ, কচুশাক, পুঁইশাক, কাঁচাপেঁপে, খেজুর, আনারস, ছোলা, বাদাম, এগুলো পরিহার করতে হবে। সচেতনতা ও সহানুভূতির সঙ্গে সুচিকিৎসার সুযোগ পেলে থ্যালাসেমিয়া রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। বিয়ে করতেও কোনো ভাবনা নেই। ■

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসেমিয়া সেন্টার; এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স, হেলথ অ্যাণ্ড ডিজিজ; অ্যানিমিয়াজ-রেডসেল ডিজঅর্ডারস (কেনেথ ব্রিজেজ)

সংলাপ রিপোর্ট

আইসিডিডিআর,বি-র ইতিহাসে কয়েকটি মাইলফলক

উনপঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আইসিডিডিআর,বি একই সঙ্গে গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজে নিবেদিত। প্রাথমিক পর্যায়ে কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ব্যবস্থাপনা ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার জন্য খ্যাত হলেও বর্তমানে নবজাতকের জীবনরক্ষা থেকে শুরু করে এইচআইভি/এইডস-এর মতো অনেক বিষয়কে এই কেন্দ্র তার গবেষণা কর্মসূচিতে অঙ্গীভূত করেছে, যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইসিডিডিআর,বি তার উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে যেসব মাইলফলক অতিক্রম করে এসেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ:

১৯৬০
কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়

১৯৬৩
মতলব উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়

১৯৬৬
ডেমোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়

১৯৬৮
সফলতার সঙ্গে খাবার স্যালাইন পরীক্ষার সূচনা ঘটে

১৯৬৯
শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করার সঙ্গে পুনরায় মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার প্রমাণ প্রদর্শন করা হয়

১৯৭১
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হাসপাতাল কর্মীগণ বিনা বেতনে চাকরি করেও স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রাখেন

১৯৭৩
ক্লাসিক্যাল কলেরার এল টর-নামক কলেরায় রূপান্তর চিহ্নিত করা হয়

১৯৭৭
মতলবে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মসূচির সূচনা ঘটে

১৯৭৮
আইসিডিডিআর,বি প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের অধ্যাদেশ স্বাক্ষরিত হয়

১৯৮১
আরবান ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম-এর সূচনা ঘটে

১৯৮২
চালের গুঁড়ার খাবার স্যালাইন-এর ওপর মাঠ-পর্যায়ে পরীক্ষা শুরু হয়; মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের সূচনা ঘটে

১৯৮৩
মহামারী নিয়ন্ত্রণ প্রস্তুতি-শীর্ষক কর্মসূচির সূচনা ঘটে

১৯৮৪
আইসিডিডিআর,বি ইউনিসেফ-প্রদত্ত মরিস প্যাইট পুরস্কার অর্জন করে

১৯৮৫
মতলবে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির পরীক্ষা সমাপ্ত হয়; ডব্লিউসি/বিএস কলেরা টিকার পরীক্ষা শুরু হয়

১৯৮৭
আইসিডিডিআর,বি ইউএসএআইডি-প্রদত্ত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট-শীর্ষক পুরস্কার অর্জন করে

১৯৮৮
শ্বাসনালীর মারাত্মক সংক্রমণের চিকিৎসা এবং এ-বিষয়ক গবেষণা শুরু হয়

১৯৮৯
মতলবে রেকর্ড-কিপিং সিস্টেম সরকারি কর্মসূচিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে এর সম্প্রসারণ ঘটে

১৯৯৩
নতুন কলেরা-জীবাণু *Vibrio cholerae* O139 Bengal চিহ্নিত করা হয় এবং এর প্রকৃতি নিরূপণ করা হয়

১৯৯৪
খাবার স্যালাইন আবিষ্কারের পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়; কলেরা-আক্রান্ত রোয়ান্ডা শরণার্থী শিবিরে সহায়তা দানের জন্য গোমায় আইসিডিডিআর,বি মহামারী নিয়ন্ত্রণ দল প্রেরণ করে: জীবাণুর ধরন সনাক্তকরণে এবং মৃত্যুহার শতকরা ৪৮.৭ থেকে ১ ভাগেরও নিচে নামিয়ে আনতে দলটি সমর্থ হয়

১৯৯৫
গর্ভবতী মাকে নিউমোকক্কাল পলিস্যাক্কারাইড টিকা দিলে ২২ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের শিশুদেরকে সংশ্লিষ্ট রোগ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে এমন তথ্য-প্রমাণ প্রদর্শন করা হয়

আইসিডিডিআর,বি-র বর্তমান অবকাঠামোর সঙ্গে তুলনা করলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, প্রাথমিক অবস্থায় মেঘনা-ধনাগোদা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত অত্যন্ত কলেরা-প্রবণ কিছু গ্রামে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো কেবল এই বজরাটি থেকে। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এটি এখনও আমাদের মতলব উপকেন্দ্রে সংরক্ষিত আছে

১৯৯৬

কলেরা হাসপাতাল বিশ্বের সেরা ডায়রিয়া চিকিৎসা-কেন্দ্র বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন

১৯৯৮

আইসিডিডিআর,বি-র বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয়; বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় জাতীয় এইচআইভি সার্ভেইল্যান্স কর্মসূচিতে আইসিডিডিআর,বি-র অংশগ্রহণের সূচনা ঘটে

১৯৯৯

আইসিডিডিআর,বি-র বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক-সপ্তাহব্যাপী কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেন এবং ল্যানসেট-এ প্রকাশিত মারাত্মক অপুষ্টির শিকারগ্রস্ত শিশুদের জন্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দানের আহ্বান জানান

২০০০

বাংলাদেশে ডেঙ্গু মহামারী নিয়ন্ত্রণের জন্য আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়ায়; বিষয়ভিত্তিক গবেষণার জন্য কেন্দ্র ছয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের অভিযান চালায়

২০০১

আইসিডিডিআর,বি সম্মানসূচক গেইটস অ্যাওয়ার্ড ফর গ্লোবাল হেলথ-শীর্ষক পুরস্কার অর্জন করে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে এই পুরস্কারের সমমানের ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান পায়; যক্ষাবিষয়ক কর্মসূচির সূচনা ঘটে

২০০২

ডায়রিয়ায় মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর,বি জিঙ্কসম্বলিত চিকিৎসা-পদ্ধতির উপকারিতা ব্যাখ্যা করে

২০০৩

আইসিডিডিআর,বি পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে; এইচআইভি/এইডস এবং দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিষয়ভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচিতে অঙ্গীভূত হয়; প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন

২০০৫

আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশ সরকার-প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মানসূচক স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত হয়

২০০৬

শিশুদের ডায়রিয়ায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি ‘বেবি জিঙ্ক’ নামের টেবলেট খাওয়ানোর পরামর্শ প্রদান এবং এই টেবলেট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগে আইসিডিডিআর,বি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের স্বীকৃতি হিসেবে আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশ টুডে অ্যাওয়ার্ড ২০০৬-শীর্ষক পুরস্কার অর্জন করে; আইসিডিডিআর,বি নতুন লোগো প্রবর্তন করে এবং কেন্দ্রের নামের সঙ্গে Knowledge for Global Lifesaving Solutions (বৈশ্বিক পর্যায়ে জীবন রক্ষার সমাধান-সংক্রান্ত জ্ঞান)-শীর্ষক ট্যাগলাইন সংযোজিত হয়

২০০৭

যথাযথ মাত্রায় ও নিয়মে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সাফল্যের জন্য অ্যালায়েন্স ফর প্রুডেন্ট ইউজ অব অ্যান্টিবায়োটিক নামের প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বি-কে ’লীডারশিপ পুরস্কার’ প্রদান করে

আইসিডিডিআর,বি-র অব্যাহত অগ্রযাত্রায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এখন আর কেবল বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে, আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল কাজে লাগিয়ে আর্ত মানবতার সেবার জন্য গৃহীত নানা কার্যক্রম ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

আইসিডিডিআর,বি স্টাফ ক্লিনিক থেকে

কিডনীর রোগ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

কিডনী মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। আমাদের শরীরে দুইটি কিডনী থাকে। এগুলো দেখতে অনেকটা বাংলা ৫-এর মত। মেরুদণ্ডের দু'পাশে, পেটের মধ্যখানে, পিছনের দিকে এগুলোর অবস্থান। প্রত্যেকটি কিডনীতে প্রায় দশ লক্ষ নেফরোন বা ছাঁকনি থাকে। এই ছাঁকনির সাহায্যে কিডনী আমাদের দেহে ফিল্টারের কাজ করে। কিডনীর প্রধান কাজ হলো শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় জলীয় অংশ এবং দ্রবণীয় পদার্থ বের করে দেওয়া। এছাড়াও কিডনী আমাদের শরীরের পানি ও ইলেকট্রোলাইটের সমতা রক্ষা, এসিডের ভারসাম্য রক্ষা এবং বিভিন্ন হরমোন ও অষুধের বিপাক ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের প্রতি আমাদের যতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত আমরা অনেকে ততটুকু যত্নবান নই। এর কারণ হয়তোবা আমরা অনেকেই জানি না কিডনীর রোগসমুহ কত মারাত্মক এবং এর পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে। কিডনী বিকল হয়ে গেলে খুব বেশি কিছু করার থাকে না, ধুঁকে-ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া। যদিও কখনো কখনো ডায়ালাইসিস করা হয় কিংবা কিডনীও বদলানো হয়, তবুও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুলই শুধু নয়, সবসময় তা কার্যকরও হয় না।

আমাদের দেশে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক নানাবিধ কিডনীর রোগে ভুগছেন এবং প্রতিবছর প্রায় ১৫-২০ হাজার লোক শুধুমাত্র কিডনী বিকল হয়ে-যাওয়ার কারণে মারা যান। অথচ আমরা যদি স্বাস্থ্যসচেতন হই, স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলি, শিশুদের স্বাস্থ্যসমস্যার দিকে বিশেষ খেয়াল রেখে সময়মত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করি তবে কিডনীর রোগসমূহ বহুলাংশে প্রতিরোধ করতে পারি। প্রতিরোধ করা না-গেলেও কিডনীর রোগগুলোর মারাত্মক জটিলতা এড়িয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয়।

কিডনীর রোগসমূহ প্রতিরোধ করতে যা যা করবেন

- ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখবেন এবং মাঝেমাঝে [কমপক্ষে বছরে একবার] কিডনীর অবস্থা জানার জন্য রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করাবেন
- যাঁদের একবার প্রস্রাবে ইনফেকশন হয়েছে তাঁরা সর্বদা সতর্ক থাকবেন এবং বেশি করে পানি খাবেন। লক্ষণীয় যে মেয়েদের ক্ষেত্রে ইনফেকশন বেশি হয়
- ঘন-ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালা-পোড়া, প্রস্রাব লাল, ঘোলাটে বা কোকাকোলার মত রং হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন
- কিডনী, ইউরেটার বা ব্লাডারে পাথর থাকলে তা শীঘ্রই বের করার ব্যবস্থা নেবেন; নইলে ঘন-ঘন প্রস্রাবের ইনফেকশন হবে, যার ফলে কিডনী বিকল হয়ে যেতে পারে
- জ্বর, পাতলা পায়খানা বা বমি হলে রোগী ঠিকমত প্রস্রাব করে কি না খেয়াল রাখবেন। ১২-১২ ঘণ্টা প্রস্রাব বন্ধ থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন
- হেপাটাইটিস 'বি' এর ভ্যাকসিন নিজেরাও নিতে পারলে ভালো, কিন্তু শিশুদেরকে অবশ্যই দেবেন

> **কিডনী বিকল হয়ে গেলে খুব বেশি কিছু করার থাকে না, ধুঁকে-ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া**

- শিশুর গলায় বা কানে ব্যথা হলে সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শমত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন
- চুলকানি, খোশ-পাঁচড়া হলে অবহেলা না-করে চিকিৎসকের পরামর্শমত অষুধ খাবেন এবং প্রয়োগ করবেন
- ঘুম থেকে ওঠার পর শিশুর মুখ ফোলা দেখালে অথবা পায়ে পানি আসলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন
- তলপেটে বা কোমরে ব্যথা হলে বা শিশু নতুনভাবে বিছানায় প্রস্রাব করা শুরু করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন
- শিশুর মাথাব্যথা হলে রক্তচাপ মাপাবেন [মনে রাখবেন কিডনীর রোগ থেকে শিশুদেরও উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে]
- জন্মের পরপরই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত; সে প্রস্রাব করে কি না তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। খাওয়ানোর পরেও প্রস্রাব না-করলে বা ফোঁটা-ফোঁটা প্রস্রাব হলে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন [জন্মগতভাবে প্রস্রাবের রাস্তায় পর্দা বা রাস্তা সরু থাকতে পারে যা শিশুকালে অপারেশন করে ঠিক না-করলে পরে কিডনীর রোগ দেখা দিতে পারে]
- কিডনীর রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমত চলতে হবে
- সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন হবেন
- নিয়মিত ব্যায়াম করবেন

যা যা করবেন না

- ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের অষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করবেন না [এ-রোগ নিয়ন্ত্রণে না-রাখলে কিডনী বিকল হতে পারে]
- হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য যাবেন না

যা যা খাবেন

- পুষ্টিকর ও সুষম খাবার স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে খাবেন
- বেশি-করে পানি খাবেন এবং শিশুদেরকেও খাওয়ানোর অভ্যাস করাবেন
- যাদের একবার কিডনী, ইউরেটার বা মুত্রথলিতে পাথর হয়েছে তাদের আবারও পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বেশি-করে পানি ও শাক-সব্জি খাবেন
- জ্বর হলে বা অতিরিক্ত ঘাম হলে বেশি-করে পানি খাবেন। বিশেষ করে শিশুদের উচ্চমাত্রার জ্বরের সময় বেশি-করে পানি খাওয়াবেন; নাহলে হঠাৎ কিডনী বিকল হয়ে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে
- পাতলা পায়খানা বা বমি হলে অবশ্যই খাবার স্যালাইন খাবেন [মনে রাখবেন: শুধু পানি বা ডাবের পানি খেলে পানিশূন্যতা রোধ হবে না এবং এর ফলে কিডনী বিকল হয়ে যেতে পারে]
- কিডনীর রোগীদেরকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমত পথ্য খেতে হবে [যেমন, নেফ্রাইটিস হলে বা কিডনী বিকল হলে পানি, আমিষ, লবণ ও ফলমূল কম খেতে হবে এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে আমিষ বেশি খেতে হবে]

যা যা খাবেন না

- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো অষুধ খাবেন না
- গর্ভবতী মায়েদের [অবশ্যই প্রথম তিনমাস] চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো অষুধ খাওয়াবেন না
- পাতে আলগা-লবণ না-খাওয়াই ভালো ■

ডাঃ এম. মতিউর রহমান